নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা১১, পৃষ্ঠা ১২১-১৩৬
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'অন্য' জাতিরাষ্ট্রের কেচ্ছা: উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাস, সম্প্রদায় আর পরিচিতি প্রসঙ্গ[১]

সাঈদ ফেরদৌস*

১. জাতিরাষ্ট্র আর তার মানুষজন: পশ্চিমের অভিজ্ঞতার পরপারে

পশ্চিম আর অ-পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্রের আবির্ভাবটা ঐতিহাসিকভাবেই পরস্পর হতে একদম ভিন্ন ছিলো। বেশীরভাগ অপশ্চিমা সমাজে জাতিরাষ্ট্র ছিলো ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে পশ্চিম হতে আমদানী করা এক নতুন প্রপঞ্চ। আবার, এসব সমাজে পরিচিতি সংক্রান্ত ধারণা আর তার প্রক্রিয়াও পশ্চিম হতে একেবারেই আলাদা। কাজেই, উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকানো যেতে পারে যে, ঐ ফিরিঙ্গি জাতি রাষ্ট্রগুলো কি কেবল তাদের ঔপনিবেশিক পূর্বসূরীদের হাঁটা পথেই চলছে, নাকি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে তাদের ভিন্ন গতিপ্রকৃতি তৈরী হয়েছে। স্পষ্টতঃই এই প্রেক্ষাপটের একদিকে রয়েছে পশ্চিমের বস্তুগত ও মতাদর্শিক আধিপত্য আর অন্যদিকে সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই, এবং এই দুই আবার প্রক্রিয়ার দিক হতে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্র কিভাবে কাজ করে তা বুঝবার জন্য আমি বওম্যান (১৯৯৭) এর 'মাল্টিকালচারাল রিড্‌ল' ধারণাটা ব্যবহার করবো। যেখানে তিনি বলছেন, পশ্চিমের দেশগুলোয় মানুষজনের ওপর রাষ্ট্রের মতাদর্শিক বিজয় প্রতিষ্ঠিত; আর তার সুবাদেই রাষ্ট্র তাদের গায়ে কিছু নির্দিষ্ট পরিচয়-এর তকমা সেঁটে দেয়।[২] এই লেখায় আমি দেখাতে চাইবো, পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন কিছু নয়। এ কাজটি করবার জন্য আমি একদিকে উত্তর-উপনিবেশবাদী ইতিহাসবিদদের যুক্তি তুলে ধরবো; অন্যদিকে আবার উত্তর-উপনিবেশবাদী অবস্থানের সমালোচক কিছু চিন্তকদের কাজও সামনে আনবো যারা ভিন্নভাবে পশ্চিম-অপশ্চিমের ইতিহাসগত ভিন্নতাকে গুরুত্ব দেন।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা বলছেন, উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে (যথা, ভারত কিংবা বাংলাদেশের মতো সমাজে) জাতিরাষ্ট্র তার বলপ্রয়োগী বৈশিষ্ট্য নিয়ে জারী থাকে; পশ্চিমের মতো এখানে মতাদর্শিক প্রভাব ততো জোরালো নয়। সে কারণেই এসব

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল:shouptik@yahoo.com

সমাজে এমন অনেক পরিসর রয়েছে, যেখানে মানুষজন, বিশেষতঃ নিম্নবর্গ নিজেদেরকে রাষ্ট্র, বা জাতি কোনোটার সাথেই সনাক্ত না করে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের (community) সাথে সনাক্ত করে। কিন্তু একেবারে ভিন্ন যুক্তি ধরে এগিয়ে অনেক সমাজ চিন্তক বলছেন যে, খোদ অপশ্চিমেও রাষ্ট্র-র মতাদর্শিক প্রভাব বিস্তারের আকাংখা, প্রচেষ্টা ও গুরুত্ব মোটেই কম ছিলো না। আর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাবল্য সত্ত্বেও নিম্নবর্গ তার স্বতন্ত্র পরিসর রক্ষা করেছে, এমন দাবিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন তারা।

পশ্চিম-অপশ্চিমের ইতিহাস বিশ্লেষক এই ভিন্ন ভিন্ন ধারার পাঠ হতে আমি আগু বেড়ে বলবো, অপশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের ভেতরেও, রাষ্ট্রের আরোপিত পরিচয়ের বাইরে চলমান পরিচয় কিংবা সমঝোতামূলক পরিচয় এর সম্ভাবনা তৈরী হয়, যা পশ্চিমের অভিজ্ঞতা হতে খুবই ভিন্ন। ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রের বিশ্লেষণ আর পাশাপাশি কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ হতে আমি বিষয়টি তুলে ধরবো।

২. পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্র : জনগণের ওপর রাষ্ট্রের মতাদর্শিক জয়

দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপটের জাতিরাষ্ট্রের তুলনায় ঢুকবার আগে আমি বওম্যানের 'রিড্‌ল' ধারণাটি বুঝতে চাইবো। তিনি বলছেন, পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্রগুলো জাতিসত্তাগতভাবে এবং ধর্মীয়ভাবে নিরপেক্ষতার দাবি করে (বওম্যান ১৯৯৯: ২৯-৫৫) আর তার মধ্য দিয়ে নিজেকে বহুসাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে দাবি করে থাকে। বওম্যানের তোলা যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমার আগ্রহ তা হলো, কিভাবে জাতিরাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর ওপর মতাদর্শিক বিজয় সাধন করে। প্রকৃতপক্ষে জাতিরাষ্ট্র আদতেই যে জাতিসত্তাগতভাবে কিংবা ধর্মীয়ভাবে নিরপেক্ষ নয়, তা বলবার মাধ্যমে এহেন রাষ্ট্রের মতাদর্শিক বিজয়ের কৌশলটিই স্পষ্ট হয়।

বওম্যানের যুক্তি হ'লো, জাতিরাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন হতেই পশ্চিমে 'স্বীয় নাগরিকদের মধ্যকার জাতিসত্তার সীমানাগুলোকে অতিক্রমের' চেষ্টা করেছে। সেই প্রক্রিয়াতে 'অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্রই ...কিছু জাতিগোষ্ঠীকে (নিজের ভেতরে)[৩] অন্তর্ভুক্ত করেছে, অন্যদেরকে বাদ দিয়েছে' (বওম্যান ১৯৯৯: ৩১)। কিন্তু যখন কোনো জাতিগোষ্ঠী অপরাপর সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর তুলনায় প্রান্তিক কিংবা বঞ্চিত হয়, তখন জাতিরাষ্ট্র কিভাবে তার মীমাংসা করে? তিনি দুটো উত্তর খুঁজে পেয়েছেন; প্রথমটি, কল্যাণের নীতি, যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সকলের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের কথা বলে। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের সাফল্যের দ্বিতীয় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হ'লো মতাদর্শিক (বওম্যান ১৯৯৯: ৩২)। এ পর্যায়ে বওম্যান তার পাঠকদেরকে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের শরণাপন্ন করেন। অ্যান্ডারসন জাতিকে সংজ্ঞায়িত করেন 'ইমাজিন্‌ড

কম্যুনিটি' বলে, যা তার বিখ্যাত বইটারও নাম। বইটির ভূমিকাতে তিনি ব্যাখ্যা দেন জাতি কিভাবে একাধারে 'কল্পিত'-ও আবার 'সম্প্রদায়'-ও।

অ্যান্ডারসন বলছেন, জাতি '...*কল্পিত*, কেননা ক্ষুদ্রতম জাতির সদস্যরাও কখনোই তাদের বেশীরভাগ সহ-সদস্যদের চিনবে না ...অথচ প্রত্যেকের মানসপটেই তাদের যোগাযোগের ছবিটি বিরাজমান' (অ্যান্ডারসন ১৯৮৩ঃ ১৫)। আবার, 'তা সম্প্রদায় হিসেবে কল্পিত, কেননা ... জাতিকে সবসময়ই গভীর, সমান্তরাল কমরেডশীপ অর্থেই বিবেচনা করা হয়।' এ এমন এক ভ্রাতৃত্ব, যার জন্য লক্ষ মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত (অ্যান্ডারসন ১৯৮৩ঃ ১৬)। একদিক দিয়ে দেখলে, মানুষজনের বংশ পরম্পরা সম্পর্কিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই জাতিত্ব অর্জিত হয়। যেমনটা বওম্যান বলছেন, 'মানুষজন নিজেদেরকে বিশ্বাসের (ভিত্তিতে গড়ে ওঠা) সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ভাবে' (বওম্যান ১৯৯৯ঃ ৩৮)। আবার অন্যদিকে, নতুন জাতীয়তাবাদ ভাষা আর মুদ্রণ মিডিয়ার মাধ্যমে চার্চের ক্ষমতাকে হজম করে এবং একাধারে প্রতিস্থাপন করে তার নিজের ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। অ্যান্ডারসন এই প্রক্রিয়ার নাম দেন 'মুদ্রণ পুঁজিবাদ' (অ্যান্ডারসন ১৯৮৩ঃ ২৪)।

জাতিরাষ্ট্র যে জাতিসত্তাগতভাবে নিরপেক্ষ নয়, বওম্যান তার এই অনুমিতি প্রমাণে অ্যান্ডারসনের তত্ত্বায়নের সাহায্য নেন। একইভাবে, আদিতে রুশোর ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় 'সিভিল ধর্ম' যা পরে রবার্ট বেলাহ গ্রহণ করেন (বেলাহ ১৯৬৬), তা পাঠকদের কাছে হাজির করে বওম্যান এটা প্রমাণেও ব্রতী হন যে, জাতিরাষ্ট্র আসলে ধর্মীয়ভাবেও পক্ষপাতমূলক। প্রত্যয়টির মূল উপাদান ছিলো, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আগামীর জীবন হলো সদ্‌গুণের পুরস্কার আর মন্দের শাস্তির এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বর্জনের' (বেলাহ ১৯৬৬ঃ ৫)। বেলাহ দেখেন যে, এই ধারণাগুলো মার্কিন রাষ্ট্রীয় আচারে, যেমন, কেনেডির অভিষেক কিংবা ওয়াশিংটনের বিদায় অনুষ্ঠানেও দেখা যায়। তিনি দেখতে পান, এহেন ব্যবহারে 'ঈশ্বর'-এর উচ্চারণ '... মুক্তি কিংবা ভালবাসার চাইতে অনেক বেশী শৃংখলা, আইন আর অধিকারের সাথে সম্পর্কিত' (বেলাহ ১৯৬৬ঃ ৭)। কেন রাষ্ট্র এভাবে ধর্মকে এই ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করে ? উত্তর হলো, যুক্তিবাদী ভাষাকে ছাড়িয়ে তার আরও মহান কিছুকে প্রয়োজন; রাষ্ট্র নিজেকে (ঈশ্বরের) পছন্দ করা মানুষদের আবাসভূমি হিসেবে দাবি করতে চায় (বওম্যান ১৯৯৯ঃ ৪২)।

বেলাহ আর অ্যান্ডারসন এই যুক্তি বওম্যানকে যোগান দেন যে, জাতিরাষ্ট্র না জাতিসত্তাগতভাবে, না ধর্মীয়ভাবে পক্ষপাতবিহীন। রাষ্ট্র প্রায়শঃই এই দুই নির্মাণকে অনিবার্য আঙ্গিকে গ্রহণ করে। বওম্যান দেখাচ্ছেন, রাষ্ট্র কিভাবে তার জনগণের ওপর ধর্মীয় এবং জাতিগত তকমা এঁটে দেয় আর তার পরে ঐ তকমা ধরেই ফের তাকে শাসন করে। অনেক ক্ষেত্রেই যে মানুষজন এহেন ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে চায়,

তারাও খোদ এসব রাষ্ট্রিক প্রকল্পের স্বরকে আত্মস্থ করে, ব্যবহার করে। যখন মানুষজন তাদের ওপর আরোপিত কোনো তক্‌মা/লেবেল-কে অস্বীকার করে, তখন এর মধ্য দিয়ে তারাও অন্য কোনো অনিবার্য পরিচয়ের সাথে নিজেদের যুক্ত করে। কোমারফদের প্রত্যয়নের ব্যবহার করে বওম্যান এই অনিবার্যকরণ প্রক্রিয়াকে বলছেন 'বস্তুগণ্যকরণ' (reification)[৪]; পরে আরো এগিয়ে বার্গার ও ল্যুকম্যান এর ধারণা ধরে তিনি এর নাম প্রস্তাব করছেন 'বস্তুকরণ' (thingification; বওম্যান ১৯৯৯: ৬২-৩)। মার্ক্সীয় এই ধারণার অর্থ হলো ধারণাগুলোকে বস্তুতে পরিণত করা, প্রাকৃতিক উপাদানে পরিণত করা, আর এভাবেই তাদের প্রশ্নাতীত করে ফেলা। অর্থাৎ বওম্যান প্রস্তাব করছেন যে, বিগত শতকগুলোতে পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রসমূহ তাদের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীদেরকে দৃশ্যমান বলপ্রয়োগী শক্তি দিয়ে শাসন করেনি বরং জাতীয়তাবাদের 'মধুর' (বওম্যানের ভাষায় sweet; বওম্যান ১৯৯৯) মতাদর্শ 'বস্তুগণ্যকরণ' (reification) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

বওম্যান তার কাজে 'হেজেমনি' ধারণাটা তেমন করে ব্যবহার করেননি, কিংবা তাকে তার ব্যবহৃত 'বস্তুগণ্যকরণ' (reification) ধারণার সাথে যুক্তও করেননি। কিন্তু যে কেউই দেখতে পারে যে, 'হেজেমনি' হ'লো সেই মতাদর্শিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে শাসকরা আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবে শাসিতদেরকে নিজেদের মিত্রে পরিণত করে (গ্রামসি ১৯৭৬: ৫৫-৫৭)। পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রে এমনটাই ঘটে। বওম্যান 'বস্তুগণ্যকরণ' প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা বলেন, সেখানেও এই একই বিষয় দেখা যায়, জনগণ নিদেনপক্ষে নিজেদেরকে জাতিরাষ্ট্রের অংশ বলে বিশ্বাস করে। এর ফলে, রাষ্ট্রের পক্ষে তার অস্তিত্বকালের একটা বড় অংশ জুড়ে নিজের বলপ্রয়োগী চেহারাটা আড়াল করে রাখা সহজ হয়। কিন্তু যা আমি গোড়াতেই বলেছিলাম, রাষ্ট্রের এই মতাদর্শিক শ্রেষ্ঠত্বের গল্পটা সর্বজনীন কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের কাছে 'অন্য' জাতিরাষ্ট্রের ভিন্ন কিছু প্রেক্ষাপট হাজির করবো, দেখাতে চাইবো অপশ্চিমা সমাজ যথা, বাংলাদেশ কি ভারতে কেন কিংবা কিভাবে ভিন্নতাগুলো ঘটে থাকে।

৩.১ 'অন্য' জাতিরাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক উত্তরসূরিতা

উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের মতে, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে, (যথা ভারত অথবা বাংলাদেশে) পশ্চিমের চাইতে একেবারে উল্টোভাবে, জাতিরাষ্ট্র তার অধীন জনগোষ্ঠীকে কি জাতি, কি রাষ্ট্র, এর যে কোনোটার সাথেই যুক্ত করতে ব্যাপকমাত্রায় ব্যর্থ হয়েছে। বরং বলপ্রয়োগের অযুত দৃষ্টান্ত এটা স্পষ্ট করে যে, জাতি একটা অভিজাতকেন্দ্রীক প্রকল্প হিসেবে তার হেজেমনি ছড়াতে ব্যর্থ হয়েছে আর সেই ব্যর্থতা উৎরাতে গিয়ে রাষ্ট্রকে জনগণের ওপর আধিপত্য চর্চা করতে হয়। এরকম প্রেক্ষাপটকে বুঝতে গিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা

ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসকে ফিরে দেখছেন। এ যাবৎ ছাপা হওয়া তাদের বারো খন্ডের কাজে তারা অনুপুংখ বিস্তৃত করেছেন কিভাবে ভারতে জাতিরাষ্ট্র তার ঔপনিবেশিক পূর্বপুরুষের রাষ্ট্রের চাইতে ঐতিহাসিকভাবেই আলাদা।

সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর প্রথম খন্ডের প্রথম লেখাটাই দলটির স্থপতি ব্যক্তিত্ব রণজিৎ গুহের (গুহ: ১৯৮২); সেটিকে পুরো প্রকল্পের ঘোষণাপত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে। ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বের অপর্যাপ্ততা তুলে ধরতে গিয়ে, গুহ বিষয়টিকে ভারতীয় ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের জটিলতার সাথে সম্পর্কিত করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উপনিবেশকারী এবং প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী উভয়ই দেখেছেন অভিজাত শ্রেণী-র অর্জন হিসেবে। প্রথমোক্ত দলের মতে, ঔপনিবেশিক অভিজাতরা জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা তৈরী করেছেন আর স্থানীয় অভিজাতরা তাতে সাড়া দিয়েছেন। দ্বিতীয় দলের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিলো 'একটা আদর্শিক প্রকল্প, যেখানে স্থানিক অভিজাতরা জনগণকে অবদমন হতে মুক্তির পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন' (গুহ ১৯৮২: ২)। গুহ বলছেন, এই উভয় জাতীয়তাবাদই জনগণের অবদানকে বুঝতে, স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অভিজাতদের উদ্যোগে মতাদর্শিকভাবে প্রভাবিত হলেই কেবল জনগণ সক্রিয় হয়, এমনটা তারা দেখেছেন। বিপরীতে গুহ বলছেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনে জনগণ 'নিজ থেকে' অবদান রেখেছেন, 'অভিজাতদের থেকে স্বতন্ত্র থেকে' কাজটা করেছেন (গুহ ১৯৮২: ৩)। তিনি জনগণের একটা 'সার্বভৌম' রাজনৈতিক পরিসর আবিস্কারের চেষ্টা করেন। গুহর মতে, 'তা অভিজাত-র রাজনীতি হতে জন্ম নেয়নি কিংবা তার অস্তিত্বও পরবর্তীটি (অভিজাত রাজনীতি)-র উপর নির্ভরশীল নয়। অভিজাত রাজনীতির মতো তা ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা অকার্যকর হয়ে পড়েনি' (গুহ ১৯৮২: ৪)। অভিজাত রাজনীতি বৃটিশ সংসদীয় রাজনীতির ঔপনিবেশিক গলাধঃকরণের মাধ্যমে চালিত হয়েছিলো। তাদের তৎপরতা ছিলো আইন ও সংবিধানমুখীন। সামগ্রিকভাবে তারা ছিলেন সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে জনগণের নড়াচড়া ছিলো সহিংস, স্বতঃস্ফূর্ত এবং তা ছিলো শাসকের প্রভাব ও রূপান্তরণের বাইরে (গুহ: ১৯৮২: ৪-৫)। রণজিৎ গুহ আর তার সহকর্মীরা এই সার্বভৌম জনগণ ডাকবার জন্য গ্রামসির ভান্ডার হতে শব্দ চয়ন করেন, 'সাবঅল্টার্ন' বা নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গ-র অস্তিত্ব ইতিহাসের সত্যেই লুকানো ছিলো, আর তা হ'লো– যেমনটা গুহ ব্যাখ্যা করেন, 'জাতির পক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়ার বলতে না পারার ব্যর্থতা'-র মাঝে (গুহ ১৯৮২: ৫)। একটা জাতি হিসেবে ভারত ব্যর্থ হয়েছে 'তার নিজের হয়ে উঠতে' (গুহ ১৯৮২: ৭)। গুহ কিংবা তার অনুসারীদের এই, 'স্বাতন্ত্র্য', 'সাবভৌমত্ব' খোঁজা নিয়ে, উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি ও রাষ্ট্রের 'নিজের হয়ে উঠতে পারা' নিয়ে বড়সর প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। তারা অপশ্চিমা সমাজের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সজ্ঞান, কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিকতার উদ্‌যাপন নিয়ে সংশয়ী। তাদের উত্থাপিত এসব প্রসঙ্গও আমার এই লেখার বিবেচ্য।

'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' এর নবম খন্ডে প্রকাশিত আরেকটা প্রবন্ধে গুহ বিস্তৃত করেন, কেন, কিভাবে, ভারতে জাতি তার নিজের হয়ে উঠতে পারেনি, সেই ব্যাখ্যা। সেখানে তিনি ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রকে তার ঔপনিবেশিক পূর্বপুরুষের রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করেন। লেখাটার কেন্দ্রীয় যুক্তি হ'লো পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্র স্কুল, শিক্ষা, ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে রাষ্ট্রিক মতাদর্শ ছড়ানোর কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলো। সেখানে এমনকি উনবিংশ শতকেই বৃটিশ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আর রাষ্ট্রবাদ আনবার পরেও ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে এর কোনোটাই তেমন একটা ভূমিকা নিতে পারেনি, যেমনটা তারা মেট্রোপলিটন বৃটেনে পেরেছিলো। এমন ঘটবার কারণ প্রথমতঃ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর খুবই ছোটো একটা অংশেই মাত্র শিক্ষার প্রসার ঘটেছিলো; ফলে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শাসকদের হেজেমনি ছড়াতে সামান্যই সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ গুহ বলেন, ভারতকে নিছকই একটা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখাটা ছিলো বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের ভ্রান্তি। ইউরোপের হেজেমনিক রাষ্ট্রে, নাগরিকবৃন্দ স্ব-স্ব বিদ্বৎ সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলো; ফলে, বুর্জোয়ারা সকলের হয়ে বলবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলো। এমন কোনো সম্পৃক্তি ঔপনিবেশিক ভারতে ঘটেনি, 'যেখানে এক বিচ্ছিন্ন শক্তি নাগরিকবিহীন একটা রাষ্ট্রকে শাসন করেছে' (গুহ ১৯৯৬ : ৩)। রাষ্ট্রবাদের এমন অক্ষমতা 'জনগণের খন্ড খন্ড অংশ' কে টিকিয়ে রাখে, যারা রাষ্ট্রবাদী প্রকল্পের বাইরে বাস করে।[৫] গুহ এই প্রকল্পটি বিস্তৃত করেন তার বই 'ডমিন্যান্স উইদাউট হেজেমনি'-তে। প্রাককথনে তিনি বলছেন, 'মেট্রোপলিটন রাষ্ট্র ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট আধিপত্য সমেতই চারিত্রিক ভাবে হেজেমনিক, যেখানে প্রভাববিস্তারের মুহূর্তটি বলপ্রয়োগকে হটিয়ে দেয়, সেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিলো নন-হেজেমনিক, তার আধিপত্যের কাঠামোতে বলপ্রয়োগ প্রভাববিস্তারকে হটিয়ে দেয়'(গুহ ১৯৯৭: xii)।

যদিও এ প্রসঙ্গে একদম উল্টো ধারণাও রয়েছে। ভারতে বৃটিশদের ইংরেজী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং ইংরেজী সাহিত্য-পাঠ চালু করবার তাগিদ বিশ্লেষণ করে বিশ্বনাথন (১৯৮৯) দেখান কিভাবে মতাদর্শিক ছদ্মাবরণে ঔপনিবেশিক শাসন এখানে খুঁটি গাঁড়তে চেয়েছিলো। এই প্রসঙ্গটি এবং একটু আগে বলা নিম্নবর্গের সার্বভৌমত্ব বা স্বাতন্ত্র্য খোঁজা-র প্রসঙ্গটি, এই দু'টো বিষয়ে কিছু পরেই আমি আলোচনা করবো। এখানটায় আপাততঃ গুহর আলোচনাই গুছিয়ে নিতে চাই।

গুহ ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতা-র একটা সাধারণ বিন্যাস তুলে ধরে দেখান, সেখানে নাগরিকত্বের কোনো স্বীকৃতি ছিলো না, ক্ষমতা কেবল শাসক ও শাসিতের মাঝে এবং সমাজের অন্যত্র একসারি অসমতা রূপে অস্তিত্বমান। এই অসমতা, 'আধিপত্য' ও 'অধঃস্তনতা'-র সাধারণ সম্পর্ক হতে সৃষ্ট; এই দুটো বিষয়ও আবার একজোড়া পরস্পর সম্পর্কিত উপাদান দিয়ে গঠিত: 'আধিপত্য' গঠিত 'বলপ্রয়োগ' ও 'প্রভাববিস্তার' দ্বারা;

'অধঃস্তনতা' গঠিত 'সহযোগিতা' ও 'প্রতিরোধ' দ্বারা (গুহ ১৯৯৭: ২১)। ঔপনিবেশিক ভারতে 'প্রভাববিস্তার' প্রকৃত অর্থে ছিলো খুবই সীমিত এবং শাসকরা তাদের আধিপত্য কায়েম করেছিলো 'বলপ্রয়োগ' করে। আবার 'অধঃস্তনতা'-র ক্ষেত্রে গুটিকয়েক স্থানীয় অভিজাত 'সহযোগিতা'-র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে, বিপরীতে ঐতিহ্যমুখীন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে ছিলো চরম প্রতিরোধী।

ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কিত গুহর বিশ্লেষণ দাবি করে, উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে একটা নন-হেজেমনিক চরিত্র ধারণ করে। স্থানীয় অভিজাতদের প্রভাব বিস্তার ছিলো খুবই সীমিত পর্যায়ের এবং জনসাধারণ প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক শাসকদের এবং তৎপরবর্তীতে স্থানীয় অভিজাতদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের সার্বভৌম পরিসর রক্ষা করে। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আরো সুনির্দিষ্ট বোঝাবুঝির জন্য আমি এখন গুহ-র আরেক সহকর্মী পার্থ চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণ (১৯৯৩) দেখবো ।

৩.২ 'অন্য' জাতিরাষ্ট্র : উপনিবেশ-বিরোধী হতে উত্তর-ঔপনিবেশিক

চ্যাটার্জী একই জাতিত্বের ভেতরকার সার্বভৌম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার ভিন্নতার ওপর জোর দেন এবং সম্প্রদায়ের সাথে মানুষের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন। গুহর মতো তিনিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিনবত্বের ওপর আলোকপাত করেন, উত্তর-ঔপনিবেশিক বর্তমান বুঝতে ঔপনিবেশিক অতীতের বরাত নেন।

অ্যান্ডারসন এর বক্তব্য প্রসঙ্গে চ্যাটার্জী একটা কেন্দ্রীয় আপত্তি তোলেন। 'যদি বাকী পৃথিবীর জাতীয়তাবাদসমূহকে কিছু নির্দিষ্ট মড্যুলার ধরন হতে নিজেদের কল্পিত সম্প্রদায় বেছে নিতে হয় ... তাদের কি-ই বা অবশিষ্ট থাকবে কল্পনার জন্য?' (চ্যাটার্জী ১৯৯৩: ৫)। তিনি বলেন, অ্যান্ডারসনের তত্ত্বকে তিনি উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তার মতে 'এশিয়া আর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদী কল্পনা একটা পরিচয়ের ওপর ভর করে না দাঁড়িয়ে বরং আধুনিক রাষ্ট্রের বানানো জাতীয় সমাজের মড্যুলার ধরনের সাথে রচিত *পার্থক্যের* ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছে' (চ্যাটার্জী ১৯৯৩: ৫)। একজন সাবঅল্টার্নিস্ট হিসেবে চ্যাটার্জী দাবী করেন, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর অনুশীলনকে বস্তুগত আর আধ্যাত্মিক এই দুই পরিসরে ভাগ করে ঔপনিবেশিক সমাজের ভেতরেই তার সার্বভৌম পরিসর তৈরী করেছিলো। বস্তুগত পরিসরে পশ্চিম তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, পূর্ব তাকে অনুকরণ করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিসর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের 'নির্যাস'কে (essence) বহন করে, যেখানে পশ্চিম ফাটল ধরাতে পারেনি (চ্যাটার্জী ১৯৯৩: ৭)। তিনি আধ্যাত্মিক পরিসরের বিভিন্ন ক্ষেত্র সনাক্ত করেন, যেমন ভাষা, ধর্ম, পরিবার, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদি। ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাজনীতিতে, নতুন

বিকাশমান জাতীয়তাবাদকে পশ্চিম হতে তার স্বাতন্ত্র্য দাবিতে বাধ্য হতে হচ্ছিলো। যতোই সে বিকশিত হতে থাকলো, ততোই তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিজস্বতার দাবি প্রবলতর হ'লো। তা করতে গিয়ে এই পরিসর বিস্তৃত হতে লাগলো, অন্তর্গতভাবে পৃথকায়িত হ'লো এবং সর্বোপরি একটা জাতীয় রূপ সে ধারণ করলো, আর তা হ'লো– উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র (চ্যাটার্জী ১৯৯৩: ১০)।

আমার কাছে চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ কেননা, তা জাতিত্বের সরল, অগভীর সমরূপকরণকে প্রত্যাখ্যান করে, ভিন্নতার ওপর জোর দেয়। তিনি আফসোস করে বলেন যে, ভারতে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নতুন আঙ্গিকের সম্প্রদায়কে সনাক্ত করার বদলে পুরনো আধুনিক রাষ্ট্রের সমরূপী প্রকল্পের কাছেই নিজেকে সঁপে দিলো। ফলতঃ, সে তার নিজ সমাজের সম্প্রদায়ের গুরুত্বকেই উপেক্ষা করলো। পরবর্তী অংশে পার্থ চ্যাটার্জী ভারতে সম্প্রদায়ের নমনীয় এবং একাকার হবার মতো বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন; যেখানে তার সদস্যদের সত্তার সকল স্তর প্রকাশের বা উপস্থাপনের দাবি করা হয় না কিংবা এটাও জানতে চাওয়া হয় না যে, এমন ধরন পৃথিবীতে আর ক'খানা আছে (চ্যাটার্জী ১৯৯৩: ২২৩)। সম্প্রদায়ের এমন ধারণায়ন সমাজে অ-নির্যাসবাদী (non-essentialist) পরিচয়ের পথ তৈরী করে।

৩.৩ 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' ইতিহাসকে ভিন্ন চোখে দেখা

সাবঅল্টার্নিস্টদের উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসবীক্ষণ নিয়ে বড়সর আপত্তি উঠেছে যে দুটো প্রশ্নে, এবারে আমরা সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবো। তালাল আসাদ কিংবা আরিফ দিরলিক প্রশ্ন তুলেছেন 'নিম্নবর্গ'-র 'স্বাতন্ত্র্য', 'সার্বভৌমত্ব' খোঁজা, কিংবা ভারত নামক জাতিরাষ্ট্রের 'নিজের না হয়ে উঠতে পারা' নিয়ে। তারা এই ইতিহাস প্রকল্পে নির্যাসবাদিতার (essentialism) আভাস খুঁজে পান। অপর প্রশ্নটি ছিলো রাষ্ট্র ও হেজেমনি-র সম্পর্ক প্রসঙ্গে; এক্ষেত্রে গৌরী বিশ্বনাথনের কাজটি রণজিৎ গুহর বিশ্লেষণের উল্টোছবি আমাদেরকে দেয়। আর এসব বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে প্রকারান্তরে আমরা সাবঅল্টার্নিস্টদের দেখা উত্তর-ঔপনিবেশিক তথা অপশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবো। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা 'নিম্নবর্গ'-র যে 'স্বাতন্ত্র্য', 'সার্বভৌমত্ব', 'খাঁটিত্ব' খুঁজে পেয়েছেন, তাকে ভীষণই সমস্যাজনক বলে মনে করছেন তালাল আসাদ (১৯৯৩)। এই ইতিহাস প্রকল্প সম্পর্কে ও'হ্যানলিনের (১৯৮৮) উত্থাপিত সংশয়ের বরাত দিয়ে আসাদ বলেন, এরা আত্মনির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন, যা নির্যাসবাদী মানবতাবাদের (essentialist humanism) গর্তে পড়ে। আসাদ মনে করেন, আত্মনির্মাণ পশ্চিমের একটি উদার মানবতাবাদী নীতি, আধুনিক/আধুনিকায়নকারী রাষ্ট্রে যার ব্যাপক-বিস্তৃত নৈতিক, আইনী, রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা রয়েছে (আসাদ ১৯৯৩: ১৪-১৫)। অথচ এই নীতির ওপর ভর করেই গুহ

এবং তার অনুসারীগণ উত্তর-ঔপনিবেশিক (অপশ্চিম) বাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য দাবী করেন। নিম্নবর্গীয়-র এহেন 'স্বাতন্ত্র্য', 'সার্বভৌমত্ব' সন্ধানকে প্রত্যাখ্যান করে বিপরীতে আসাদ স্পষ্ট করেন যে, উপনিবেশিত-র ইতিহাসকে উপনিবেশকারীর ইতিহাস হতে পৃথক করা সঙ্গত নয় (আসাদ ১৯৯৩: ১৮)। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে নিছকই অবদমনমূলক হিসেবে দেখেন, অন্যদিকে আসাদ বলেন নিজ সম্প্রসারণের স্বার্থেই এ ক্ষমতা ছিলো গঠনমূলক (আসাদ ১৯৯৩: ১৭)। উপনিবেশিত হবার পরেও সমাজের একটি অংশ (যথা নিম্নবর্গ) রূপান্তরিত হয়নি, হেজেমনির বাইরে থেকে গিয়ে তারা নিজেদের 'স্বাতন্ত্র্য', 'সার্বভৌমত্ব', 'খাঁটিত্ব' রক্ষা করতে পেরেছে, এমন দাবী কতটা যৌক্তিক? নিম্নবর্গের এহেন সন্ধানের মধ্যদিয়ে এই ইতিহাসবিদরা 'নিম্নবর্গ' কিংবা ভারত নামক জাতিরাষ্ট্র-কে নির্যাসমূলক (essential) ঢংয়ে ব্যবহার করেছেন বলে আসাদ মনে করেন (আসাদ ১৯৯৩: ১৮)।

একইরকম বিশ্লেষণে পৌছান আরিফ দিরলিক (১৯৯৪ দেখুন মঙ্গিয়া ১৯৯৬) 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' তাত্ত্বিকদের প্রসঙ্গে। এসব তাত্ত্বিকরাও 'তৃতীয় বিশ্ব' প্রত্যয়টির বিপরীতে 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' প্রত্যয়টিকে দাঁড় করাতে গিয়ে বলেন, পূর্বোক্ত প্রত্যয়টি পশ্চিমা ডিসকোর্সের স্বরেই কথা বলে, এই ডিসকোর্সের মধ্যেই তা প্রোথিত ছিলো (মঙ্গিয়া ১৯৯৬: ২৯৯); 'তৃতীয় বিশ্ব' নিজের সার্বভৌমত্ব দাঁড় করাতে পারেনি (অর্থাৎ বিপরীতে 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' প্রত্যয়টি পশ্চিমা ডিসকোর্সের বাইরে তার স্বাতন্ত্র্য দাঁড় করাবে এই তাদের প্রত্যাশা)। জ্ঞান প্রকাশ, এই ধারার একজন তাত্ত্বিক, যিনি নিম্নবর্গ প্রকল্পেরও একজন অংশীদার মনে করেন, নিম্নবর্গ হবে তার নিজের ইতিহাসের রচয়িতা (মঙ্গিয়া ১৯৯৬: ২৯৭)। দিরলিক অভিযোগ করেন, 'উত্তর-ঔপনিবেশিক'-এর এই নিজস্বতা খুঁজতে গিয়ে, খোদ উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজেই আধুনিকায়ন কিংবা জাতিরাষ্ট্রের প্রতি সমাজের কোনো কোনো অংশের যে আকর্ষণ রয়েছে সে বিষয়টি 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' তাত্ত্বিকরা উপেক্ষা করেন; উপেক্ষা করেন উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভেতরে বিবাদমান জাতিদলগুলোকে, যারা নিজেদের শংকরায়ন (hybridity) বিষয়ে উদাসীন, ফলতঃ তাদের তত্ত্বের সাথে বেমানান (মঙ্গিয়া ১৯৯৬: ৩০০)।

আসাদ কিংবা দিরলিক নির্যাসবাদিতার (essentialism) যে ইঙ্গিত দেন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদদের প্রসঙ্গে, একই রকম সতর্কতা আমরা দেখি পিটার ভ্যান ডার ভি'র কণ্ঠে। পার্থ চ্যাটার্জী ভারতের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর অনুশীলনকে বস্তুগত আর আধ্যাত্মিক এই দুই পরিসরে ভাগ করে, বলে যে বিশ্লেষণ দেন তার সাথে ভির একমত নন। বৃটেন ও ভারতের জাতীয়তাবাদকে বুঝতে গিয়ে ভ্যান ডার ভির বলছেন যে, এহেন সূত্রায়ণ সরলীকৃত। তার মতে 'আধ্যাত্মিক' কখনোই 'বস্তুগত' হতে পৃথক ছিলো না, যা চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন, বরং পশ্চিমের বস্তুগত জগতের সাথে লড়াইয়ে তাকে নিরন্তর ব্যবহার করা হয়েছে (ভির

২০০১: ৬৯-৭০)। কাজেই পিটার ভ্যান ডার ভির আমাদের সতর্ক করে দেন এমন নির্যাসমূলক (essential) দ্বিখন্ডনের ফাঁদে না পড়তে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বরে যখন বলা হয় জাতি কখনোই তার নিজের কাছেই আপন হয়ে ওঠেনি, প্রশ্ন করা যায়, যে জাতি তার ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতার ছাপ নিয়ে পথ চলে, সে আদৌ কোনো কালে তার নিজের হয়ে উঠতে পারে কিনা? এই 'নিজ' খোঁজাটা সঙ্গত কিনা? আবার উল্টো দিক দিয়ে, অ্যান্ডারসন, গুহ কিংবা চ্যাটার্জীর চাইতেও ভিন্ন ভাবে ভ্যান ডার ভি'র বলেন, উপনিবেশিত সমাজগুলোতে জাতিরাষ্ট্র নিছকই ঔপনিবেশিক নীল নকশার ফল হিসেবেও দাঁড়ায়নি। এটাকে কোনো কার্যকারণগত পরিণতি হিসেবে দেখা যাবে না। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতার আঁকা ছক অনুযায়ী উপনিবেশিত রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে এমন নয়। আবার ঔপনিবেশিকতার ছাপ আছে বলেই পশ্চিম হতে তার গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। আসাদ কিংবা ভি'র, তাই বারংবারই উপনিবেশিত আর উপনিবেশকারীকে সম্পর্কিত করে দেখবার কথা বলেন। আর এই সম্পর্কের ভেতরেই থাকে মানুষজনের পথ খোঁজবার লড়াই।

নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের কাজে রাষ্ট্র ও মতাদর্শিক প্রভাবিস্তারের সম্পর্কটি যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, এবারে সে প্রসঙ্গে ফেরা যাক। রণজিৎ গুহর একটা বড় দাবি ছিলো যে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্র চরিত্রগতভাবে নন-হেজেমনিক। একালে এই দাবি কতটা ধোপে টেকে, সে প্রশ্ন আমি কিছু আগে একটি টীকায় উপস্থাপন করেছি। এখানে গৌরী বিশ্বনাথনের (১৯৮৯) কাজটি উথাপন করা জরুরী মনে করছি, ঔপনিবেশিক ভারতীয় জাতিরাষ্ট্র প্রসঙ্গে তার একটি বিশ্লেষণের জন্য। 'মাস্কস অফ কনকোয়েস্ট' বইতে বিশ্বনাথন ভারতে বৃটিশ শাসনে সাহিত্য-পাঠ এর ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন। যেখানে গুহ বলছেন রাষ্ট্রের গায়ের জোরের কথা সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলছেন, কেন ভারতে বৃটিশরা প্রত্যক্ষ সামরিক আধিপত্যের পথে না হেঁটে সাহিত্যকে বেছে নিলো (বিশ্বনাথন ১৯৮৯: ১০)? সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য কেন-ই বা ধর্ম এমনকি বিজ্ঞানকে নয়, সাহিত্য-পাঠ হলো প্রধান হাতিয়ার? কারণ, গৌরী বিশ্বনাথন বলছেন, বৃটিশ শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে গিয়ে তারা ভারতে এমন এক বিদ্বৎ মহল দাঁড় করাতে চাইলেন, যারা বৃটিশ সাহিত্য-সংস্কৃতির সমঝদার হবে, তার কাছে মাথা হেঁট করবে। এর ফলে নেটিভদের সভ্যকরণের মাধ্যমে, তাদের নৈতিক উৎকর্ষসাধনের মাধ্যমে শাসনের নৈতিক জোর প্রতিষ্ঠা করা যায়। গুহ এবং তার অনুসারীগণ যেখানে হেজেমনিকে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্র পাঠে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি, বিশ্বনাথন সেখানে গ্রামসি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর কাজটি দাঁড় করান। তার কাজে বৃটিশ শাসকদের হেজেমনি ছড়াবার আকাংখা ধরা পড়ে, সেইসাথে ঔপনিবেশিক ভারত বুঝতে 'হেজেমনি' ধারণাটির গুরুত্ব আর প্রাসঙ্গিকতাও ধরা পড়ে।

৪. জাতিরাষ্ট্র, সম্প্রদায় এবং 'নির্যাসবাদের (essentialist) পরপারের পরিচিতি'

ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিকদের পর্যালোচনা হতে আমরা অপশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের যে বিবিধ পঠন পাই, তা থেকে পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের সাথে তার একটা তুলনার পরিসর দাঁড় করানো যেতে পারে।

সাবঅল্টার্নিস্টরা ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যে আলোচনা করেন, তা পশ্চিমের জাতিরাষ্ট্র হতে তিনটি জায়গায় এদেরকে পৃথক করে। প্রথমটি হ'লো ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে জাতিরাষ্ট্রের 'নিজের না হয়ে উঠতে পারা'-র ঐতিহাসিক ব্যর্থতা; দ্বিতীয়তঃ এখানে সম্প্রদায়ের কিংবা নিম্নবর্গের নন-হেজেমনিক স্বতন্ত্র পরিসর; এবং তৃতীয়তঃ এসব সমাজে পরিচয় করণের সমঝোতা নির্ভর প্রক্রিয়া। আসাদ কিংবা দিরলিকের আলোচনা ধরে এগুলে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি নির্যাসবাদী (essentialist) আকাংখা হতে উৎসারিত বলেই প্রতীয়মান হয়। সে পথে না এগিয়ে বরং নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদদের (এ লেখায় উদ্ধৃত পার্থ-র) দেখানো তৃতীয় পথটি ধরেই এগুতে আমি আগ্রহী। যদিও ভির পার্থ-র আলোচনায় নির্যাসবাদের গন্ধ পান, আমার বিবেচনায় ভ্যান ডার ভি'র আর চ্যাটার্জী দু'জনই তাদের স্ব-স্ব দাবিতে সঠিক। আমি মনে করি না চ্যাটার্জী এ ব্যাপারে ভ্যান ডার ভি'র সাথে দ্বিমত করবেন যে, মানুষজন পশ্চিমের সাথে লড়াই করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক পরিসরকে নিরন্তর ব্যবহার করে, আর সে কারণেই তিনি কোনোভাবেই একে নির্যাসবাদী ঢংয়ে ব্যাখ্যা করেননি। বরং তা পরিচয়ের চলমান নির্মাণকেই ইঙ্গিত করে, যা আমি লেখার পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

একটি জায়গায় সাবঅল্টার্নিস্ট এবং তাদের সমালোচকদের (যাদের এই লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে) মাঝে বড়সর কোনো ব্যবধান নেই, তা হলো, উভয়েই পশ্চিম এবং অপশ্চিমের জাতিরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভিন্নতা বিষয়ে সম্যক সচেতন। ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতার কারণ মূলতঃ, পশ্চিমের জাতিরাষ্ট্র যেমন তার সমাজের ভেতর থেকে এসেছে, এক্ষেত্রে তা ঠিক উল্টোভাবে ঘটেছে। জাতিত্বের কল্পনা-প্রক্রিয়াও ভারত কিংবা অপরাপর উপনিবেশিত সমাজে পশ্চিমের চাইতে একদম ভিন্ন গোছের। ঔপনিবেশিক অভিজাতরা বৃটিশ জাতিত্বকে তার অধীন জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো, বলপ্রয়োগী ও মতাদর্শিক দু' অর্থেই। যা মানুষজনের ঔপনিবেশিক বর্তমান আর প্রাক-উপনিবেশ অতীতের মাঝে একটা ছেদ তৈরী করে দেয়। জাতির কল্পনার ক্ষেত্রে যে ফারাক তৈরী হয় তা আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তা' হলো দু' ধরনের সমাজে 'মুদ্রণ পুঁজিবাদ' এর প্রভাব ও ব্যপ্তির ভিন্নতা। অ্যান্ডারসন যেখানে রাষ্ট্রের পোক্ত হাতিয়ার হিসেবে স্কুল, শিক্ষা, মুদ্রণ কে দেখেন, গুহ বিপরীতে ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রে এসবের ক্ষেত্রকে খুবই

সীমিত দেখতে পান কেননা বেশীরভাগ লোক সেখানে পড়তে পারেনা। আবার যদি বিশ্বনাথন ধরে এগোই, ভারতে বৃটিশ শাসকের মতাদর্শিক প্রভাব বিস্তৃত হলেও, বৈশিষ্ট্যগতভাবে তা ছিলো পশ্চিমা স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের চাইতে মৌলিকভাবেই ভিন্ন। এই ভিন্ন শুরুর কারণেই আজ অবধি দু'ধরনের জাতিরাষ্ট্রের ভিন্নতা রয়েই গেছে। সেটা হালে রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবে মিডিয়ার প্রবল দাপটের পরেও সত্য, যা পশ্চিম-অপশ্চিম উভয় সমাজেই প্রবল গুরুত্ব রাখে। পাশাপাশি বস্তুগত দিক দিয়েও বড়সর পার্থক্য রয়েছে। বওম্যান ইঙ্গিত দিয়েছেন, পশ্চিমে জাতিরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তার কল্যাণ ভূমিকার সাথে যুক্ত, ভারত কিংবা বাংলাদেশের মতো ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে তা মূলতঃ অঙ্গীকার-অভিপ্রায়েই সীমাবদ্ধ। না ঔপনিবেশিক, না জাতীয় কোনো অভিজাতই জনকল্যাণ নিয়ে চিন্তিত নন। এই অনাগ্রহ আর ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে একটা বড় অংশের জনগণ রাষ্ট্রের বস্তুগণ্যকরণ (reification) প্রকল্পের বাইরে থেকে যায়, গুহরা যাদের নিম্নবর্গ নামে ডাকেন। নিম্নবর্গ রাষ্ট্রের মতাদর্শের পরপারে বাস করে, এহেন বিশ্লেষণে সঙ্গত কারণেই আমি ঢুকবেনা। তবে কি করে অপশ্চিমের মানুষজন পশ্চিমের চেয়ে ভিন্নভাবে নিজের পরিচয়কে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, তা দেখতে চাইবো।

দক্ষিণ এশীয় সমাজগুলোর কথ্য ঐতিহ্যে এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত নানা গল্প ও গান রয়েছে। এমন একটা গল্পে শোনা যায়, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গুটি কয়েক সৈন্য নবাবের বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করে বিশাল এই ভূখন্ড দখল করে নিচ্ছিলো, কৃষকরা তখন কাছেই ধান ক্ষেতে কাজ করছিলেন। এই গল্প অনুযায়ী হয় তারা আগ্রহী ছিলেন না যুদ্ধক্ষেত্রে কি হচ্ছে তা নিয়ে, নতুবা তারা জানতেনই না এসব মানুষজন কারা। শাসক-শাসিতের ব্যাপক ব্যবধান এই কাহিনীতে ধরা পড়ে; এমন ব্যবধান আজকের বাংলাদেশেও সত্য। কয়েকটা উদাহরণ টানা যায়। সকল জাতীয়তাবাদী-রাষ্ট্রীয় উৎসব, যেমন পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, শহীদ দিবস, বিজয়মেলা প্রতিবছর উদযাপিত হয় রাষ্ট্র ও অভিজাত কর্তৃক (স্কেন্দেল ২০০১: ৪০-৬)। এসব আচার অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সামান্যই আগ্রহ থাকে; তারা 'দেশপ্রেম' 'জাতীয়তাবোধ', এসব জানে, শোনে, ব্যবহারও করে কিন্তু তাদের জীবনে এসব তেমন কোনো অর্থও বহন করে না। অভিজাতরা এসব অনুষ্ঠানে 'কল্পিত সম্প্রদায়'-এর আওয়াজ তোলেন, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে জাতিকে 'সংরক্ষিত' কিংবা 'দেয়ালঘেরা সম্প্রদায়' (gated community)[৬] হিসেবেই রক্ষা করেন; অভিজাত না হলে পরে, সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই।

আবার, মানুষজন যারা কিনা জাতিরাষ্ট্রের কল্পনাকে লঙ্ঘন করে কিংবা উপেক্ষা করে এই সংরক্ষিত সম্প্রদায়ের বাইরে বাস করে, তারা যে আবশ্যিকভাবেই কোনো বিকল্প নির্যাসবাদী (essentialist) প্রকল্প তৈরী করছেন, যেমনটা বওম্যান পশ্চিমে দেখতে পান[৭] (বওম্যান ১৯৯৯: ৫৭-৮০), তেমনও নয়। বরং পার্থ যেমনটা বলেছেন, ভারতে

কি বাংলাদেশে সম্প্রদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সাথে মানুষজনের পরিচয়করণের প্রক্রিয়াটাও আগ্রহোদ্দীপক। আমাদের সমাজে একজন মানুষ চট করেই নিজের পরিচয় দেয় তার বাড়ির সুবাদে; বস্তুগতভাবে যা ভিটে/আবাস কিংবা সম্পর্কের দিক থেকে তা বংশ যা-ই হোকনা কেন। এখানে মানুষ বংশ/গুষ্টি-র কথা বলে; গ্রামের কথা বলে, দেশের বাড়ি বললে গ্রামকে বোঝায়, দেশ বললে বোঝায় জেলা, জাতিরাষ্ট্র নয়। রাজনীতিতে নির্যাসমূলক (essential) স্মারক অর্থে যেভাবে পরিচয়কে দেখা হয়, ব্যবহার করা হয়, উপরের সকল পরিচয় তার থেকে খুবই ভিন্ন। যেমনটা পার্থ বলেছেন, না এখানে সম্প্রদায় তার সদস্যের সত্তার সকল মাত্রা-র উন্মোচন নিয়ে ভাবিত, না সে সংখ্যাকে গোণে; সংখ্যা পাশ্চাত্য পরিচয়-রাজনীতিতে বড় বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিত্বের ভেতরে, এমনকি জাতি গঠন প্রক্রিয়ায়ও এই সম্প্রদায়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। ধরা যাক ১৯৭১ এর যুদ্ধের সময়ে গ্রামাঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষ, দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এই বড় কান্ডে অংশ নিয়েছিলো; তবে, কেবল তখনই যখন তার জীবনে ছেদ পড়েছিলো। কথার কথা, যখন আর্মি গ্রামে ঢুকলো, কিংবা শহর-বন্দর উজাড় করা মানুষ গ্রাম সয়লাব করে ফেললো, তখনই কেবল গ্রামের মানুষ মহা-কান্ডের স্থানিক পর্বে যুক্ত হ'লো। বহু জায়গায় সম্প্রদায়/গ্রাম শুদ্ধ মানুষ একত্রে বসেছে করণীয় ঠিক করতে। এ থেকে আমি এই দাবি করছিনা যে, মহা-কান্ডের বাইরে সম্প্রদায় সার্বভৌম, জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি সে সমর্পিত কিংবা অনুগত নয়। কিন্তু সম্প্রদায় যেন বা জাতীয়তাবাদী-রাষ্ট্রবাদী প্রকল্প-র সাথে নিজের বোঝাপড়া করে নিচ্ছে।

শেষে এসে আমি সমঝোতামূলক পরিচয়ের আরেকটা দৃষ্টান্ত দিতে চাইবো। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে বারো/তেরটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, বৃটিশরা আসবার আগে, তারা স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নামেই পরিচিত ছিলো। পরবর্তী কালে, জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও বৃটিশরা তাদের সকলকেই একনামে পাহাড়ি/হিল পিপল আখ্যা দিল। বিংশ শতকে বাঙ্গালীরা এ অঞ্চলে বাস শুরু করে। ষাটের দশকের শেষভাগে কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প আর রাষ্ট্র সমর্থিত ব্যাপক বাঙ্গালী অভিবাসনে এসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ভীষণ প্রান্তিক হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে তারা একটি যৌথ সত্তা দাঁড় করাতে চায়, একটা সাধারণ স্মারক তৈরী করতে চায় তাদের পরিচয়ের, যা জুম্ম জাতীয়তাবাদ (স্কেন্দেল: ১৯৯২) নামে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙ্গালীর প্রবল আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে। পরবর্তী দশকগুলোতে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আর্মির নির্যাতন আর ব্যাপক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবশেষে উভয়পক্ষ সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়, যেখানে এই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষদেরকে জাতি নয় 'উপজাতি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে তারা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে বাঙ্গালীর মতোই একটা জাতি হিসেবে গণ্য করে। অথচ সংবিধানে কি তাদের নিজেদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহারেও তারা নিজেদের জন্য অবমাননাকর পদটি মেনে নিয়েছেন। আবার এইসব মানুষজন জাতিসংঘের 'আদিবাসী' দিবস পালন করেন, তারা আদিবাসী

পরিচয়ের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত অধিকারের কথা জানেন; তারা আদিবাসী পরিচয়টা ব্যবহার করেন। কিন্তু 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'পাহাড়ি', 'ট্রাইব', 'জুম্মা' এই সকল পরিচয়-ই হয় বাইরের জগতের অভিজাতদের দেয়া অভিধা, নতুবা নিজেদের সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক এলিটের দেয়া অভিধা। মানুষজন এগুলোকে নমনীয়ভাবে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, অদল-বদল করে ব্যবহার করে; কোনো একটিতে স্থির থাকেনা। আমরা যদি পার্থ-র সম্প্রদায় বিষয়ক আলোচনায় ফিরে পাই, তা হলে দেখবো, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে ভিন্নতার ওপর জোর দিয়ে তিনি যথার্থ কাজই করেছেন। মানুষজন ভিন্নতাসমেত-ই সম্প্রদায়ে বাস করে। এই সম্প্রদায়গুলো অভিজাত রাষ্ট্রের নির্যাসবাদী (essentialist) প্রকল্পের মোকাবেলায়, বোঝাপড়ার মধ্যদিয়ে ঠিকই জাতি-গঠন প্রকল্পেও ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নমনীয় পরিচয় রাজনীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক সরকার দ্বারা সেটেলড্ বাঙ্গালীদের অনমনীয় পরিচয় রাজনীতি। অন্য সকল বাঙ্গালীর চাইতে তারা বেশি 'বাঙ্গালী', জাতি/সম্প্রদায়-অর্থে যত না, তার চাইতে অনেক বেশি বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের আধিয়ার-অর্থে। অভ্যন্তরীণ সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান জাতির সাথে জাতি-রাষ্ট্র একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রবল পরিচয়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা নয় বরং নির্যাসবাদী (essentialist) রাজনীতিই পরিচয়ের নিদ্ধারিক। এ জায়গাটায় এসে হেজেমনি আর আধিপত্য একইসাথে বিরাজমান হয়ে ওঠে।

৫. উপসংহার

এই লম্বা কাহিনী দু'টো জিনিস দেখায়: এক, পরিচিতি স্থির নয়, বদলযোগ্য এবং দুই, তা একটা আন্তঃসম্পর্কের বোঝাপড়া/সমঝোতা/মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বদল হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় পরিচয়করণ প্রক্রিয়া বুঝতে এই আন্তঃ সম্পর্কের বোঝাপড়া/সমঝোতা/মিথস্ক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিটার ভ্যান ডার ভির এর মতে ভারত আর বৃটেনের জাতীয়তাবাদকে বুঝতে হবে একটা মিথস্ক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; তাদেরকে স্থির, অনিবার্য বা সমগ্রবাদী পরিচয় হিসেবে দেখা যাবে না। ঔপনিবেশিকতা অসংখ্য টুকরো/খন্ড তৈরী করেছে, কিন্তু এই টুকরো/খন্ডগুলো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় রত (ভির ২০০১: ৮)। পিটার জাতীয়তাবাদকে সমরূপকরণের প্রকল্প হিসেবে দেখেন না। বওম্যান একই ধরণের ধারণা ব্যবহার করেন ডায়াসপোরায় সমঝোতামূলক বা চলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে (বওম্যান: ১৯৯৭: ২১৪)[৭]। ইংল্যান্ডে এশীয় জনগোষ্ঠী পাঞ্জাবী ভাংড়া মিউজিক পুনরুদ্ভাবন করে, এশীয় পরিচয়ের স্মারক হিসেবে। ভাংড়া কিংবা জুম্মা, উভয়ক্ষেত্রেই পরিচিতি নির্মিত হয়েছে প্রবল অন্যের মোকবেলা করতে গিয়ে, তার সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। মানুষজন এই বোঝাপড়া, সমঝোতা, পুনঃসংজ্ঞায়ন, পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে সচেতন। বওম্যান নির্যাসমূলক (essential) পরিচয়-এর বদলে চলমান পরিচয় এর কথা বলেন। তবে

তালাল আসাদ আমাদের এই পরিচয়ের রাজনীতি বুঝতে সাহায্য করেন গভীরতর পর্যায়ে। পরিচয় নির্মাণকে তিনি নিছকই সত্তার উদযাপন হিসেবে ধরে নেননি; এজেন্সী আর সক্রিয়তা দিয়ে যারা এর সরলপাঠ করেছেন, আসাদ তাদের সমালোচনা করেছেন (আসাদ ১৯৯৩: ১১)। তিনি বরং প্রান্তিকতার মাঝে মানুষ কি করে পথ খোঁজে, সেই ইঙ্গিত-ই দেন। জুম্মা কিংবা ভাংড়া উভয় বাস্তবতায়ই তার এই বিশ্লেষণ সত্য বলে মানি। অন্যদিকে চ্যাটার্জী দেখান, কি করে রাষ্ট্রের নির্যাসবাদী (essentialist) রাজনীতি সম্প্রদায়ের নমনীয় পরিচয়ের সম্ভাবনাকে কবর চাপা দিতে চায়। অপশ্চিমা সমাজে এহনে পরিস্থিতিতে, পরিচয়ের নির্যাসবাদী (essentialist) রাজনীতির বাইরে জনগণের একটা যাওয়া-আসার পরিসর আছে। তারা যেমন জাতি হতে বিযুক্ত নয়, তেমনই সকলক্ষেত্রে নিজেকে জাতিতে বিলীনও করে দেয় না।

টীকা

১. লেখাটির বড়সর ফাঁক-ফোকর ধরিয়ে দিয়ে একে পরিমার্জনা করতে সাহায্য করেছেন অজ্ঞাতনামা যে রিভ্যুয়ার, আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা রইলো তার জন্য।

২. এই সেঁটে দেবার কাজে রাষ্ট্র তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে বিধিনিষেধ, নিয়মকানুনের সুবিস্তৃত জাল, এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী, প্রয়োগক্ষম, বলপ্রয়োগী ক্ষমতা ইত্যাদি। পশ্চিমা রাষ্ট্রে পরিচয় (identity) প্রশ্নটিও এসবের সাথে সম্পর্কিত; সেখানে পরিচয় এবং তার আইনী/প্রশাসনিক/প্রশাসনিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন সাংঘাতিক তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তার সাথে রাষ্ট্র সম্পদকে ব্যবহার করতে-পারা, না-পারা অধিকার-"ভূক্ত" হওয়া, না-হওয়া বিজড়িত (নাহলে অস্তিত্ব-বিহীন হওয়া ইত্যাদি)।

৩. উদ্ধৃতির ভেতরে ব্যবহৃত '()' বন্ধনীর ভেতরকার টেক্সট মূল লেখকের নয়; তা সহজবোধ্যতার স্বার্থে আমার সংযুক্তি।

৪. বিমূর্ত ধারণাকে বস্তুর মতো করে বিবেচনা করা বা গণ্য করার প্রক্রিয়া।

৫. হালের মিডিয়া, বিশেষতঃ স্যাটেলাইট টিভি কিংবা বলিউডি সিনেমায় ভারতীয়/ হিন্দুস্তানি জাতীয়তাবাদী স্বরের সরগরম উপস্থিতি দেখলে, ক্রিকেট এবং জাতীয়তাবাদের রসায়নকে দেখলে গুহ-র এহেন বিশ্লেষণকে সমকলীন বাস্তবতায় প্রশ্নাতীত বলে মনে হয় না। ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় স্কুল, শিক্ষা, কিংবা পাঠ্যপুস্তক হয়তো মানুষজনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় মিডিয়া কিংবা ক্রিকেট-এর হাত আরো অনেকই লম্বা; তাই একালে গুহ-র স্বরে বলা খুবই সহজ নয় যে, রাষ্ট্রবাদী প্রকল্পের হেজেমনির বাইরে জনগণের খন্ড খন্ড অংশ এহেন সমাজে টিকে থাকে।

৬. 'দেয়ালঘেরা সম্প্রদায়'(gated community) ধারণাটির জন্য আমি ডাচ ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ভেলাম ফান স্কেন্দেলের কাছে ঋণী। তার সাথে বাংলাদেশের সমাজ এবং জাতিরাষ্ট্রের কল্পনা প্রসঙ্গে কথোপকথনকালে তিনি এই ধারণাটি উল্লেখ করেন।

৭. বওম্যান রাষ্ট্রের/সমাজের প্রবল (dominant) পরিচয়ের বিপরীতে মানুষজনের দাঁড় করানো গণমুখীন (demotic) পরিচয়ের কথা বলেন, যা সমঝোতামূলক, পারস্পরিক এবং অ-নির্যাসবাদী।

তথ্যসূত্র

Anderson, Benedict 1983: *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.* London: Verso.

Asad, Talal 1993: *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* Baltimore: The John Hopkins University Press.

Baumann, Gerd 1997: 'Dominant and Demotic Discourses of Culture: Their Relevance to Multi-Ethnic Alliances' in Werbner, Pnina and Tariq Mahmood: *Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the Politics of Racism.* London: Zed Books.

Baumann, Gerd 1999: *The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities.* NewYork and London: Routledge.

Bellah, Robert. 1966: 'Civil Religion in America' in *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences* 95, 1-21

Chatterjee, Partha 1993: The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. New Jersey: Princeton University Press.

Dirlik, Arif 1996: 'The Postycolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism' in Mongia, Padmini (ed.) *Contemporary Postcolonial Theory: A Reader.* London: Arnold, pp. 294-321.

Gramsci, Antonio 1976: *Prison Note Books.* London: Lawrence & Wishart.

Guha, Ranajit 1982: 'On Some Aspect of Historiography of Colonial India' in: Guha Ranajit (ed.): Subaltern Studies I: *Writings on South Asian History and Society.* Delhi: Oxford University Press, pp 1-8.

Guha, Ranajit 1996: 'Small Voices of History' in: Amin Shahid and Dipesh Chakrabarty (eds.): Subaltern Studies IX: *Writings on South Asian History and Society.* Delhi: Oxford University Press, pp 1-12.

Guha, Ranajit 1997: *Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India.* Harvard: Harvard University Press.

Schendel, Willem van 1992: 'The Invention of Jummas: State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh' in: *Modern Asian Studies.* 26, 1, 98-125

Schendel, Willem van 2001: 'Modern Times in Bangladesh' in: Schendel, Willem van and Henk Schulte Nordholt (Eds.) *Time Matters: Global and Local Time in Asian Societies.* Amsterdam: VU University Press, pp 37-55

Van der Veer, Peter 2001: *Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain.* Oxford: Princeton University Press.

Viswanathan, Gauri 1989: *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India.* Delhi: Oxford University Press.